ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1427-1434
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.363

মনসামঙ্গল কাব্যে নারীর সামাজিক অবস্থান

পুনম মুখার্জী, *গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Half of the world is made up of women and the other half of men. Yet, throughout history, women have often been neglected and marginalized by men. This reality is also reflected in literature. In the history of Bengali literature, *Mangal-kāvya* occupies a significant and memorable position. Among the different branches of this tradition, *Manasamangal* holds a unique place.

The story of Manasa and Chand Saudagar is widely known in rural Bengal and has long been transmitted through both oral and literary traditions. At its core, the narrative presents Manasa's struggle to gain recognition as a goddess. However, within the framework of *Mangal-kāvya*, her identity as a woman often becomes more prominent than her divine status. In this sense, the conflict between Manasa and Chand Saudagar can also be interpreted as a symbolic struggle between feminine agency and masculine authority.

Manasa's battle against Chand Saudagar reflects the challenges faced by a female figure within a patriarchal order. Despite resistance and opposition, she ultimately succeeds in establishing her position. Through this victory, Manasa emerges as a distinctive and powerful character in the *Mangal-kāvya* tradition.

Keywords: Manasamangal, Mangal-kāvya, Women's Social Status, Patriarchy, Medieval Bengali Literature, Goddess Manasa, Chand Saudagar, Behula, Gender Representation, Feminine Agency.

পৃথিবীর যে-কোনও জনসংখ্যার অর্ধেক জুড়ে আছে নারী। শুধু অর্ধেক জুড়ে থাকা নয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক স্তরে নারী নিজেকে প্রমাণ করেছে বারবার। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নারীর অবদান আছে। তবুও বেশিরভাগ সময় দেখা যায় পুরুষ এর ছায়াসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে নারী। তাঁর আলাদা কোনও স্বাতন্ত্র্য বা অবস্থান চিহ্নিত হয় না। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে নারীর এই স্বতন্ত্র অবস্থানকে বুঝে নেওয়ার বা পিছনে ফিরে তাকিয়ে নারীর অগ্রগতির পথকে দেখার প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। বৈদিক যুগে নারীর অবস্থান একরকম ছিল। নারীর বিদ্যাশিক্ষার অধিকার ছিল। বিশ্ববারা, ঘোষা, অপলার মতো নারীদের কথা আমরা জানতে পারি। বৈদিক থেকে বেদোত্তর এবং ধর্মশাস্ত্রের যুগে সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর ধর্ম অর্থাৎ তার কর্তব্য, আচরণ ও সামাজিক অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তনের সূত্রপাত হতে

থাকে। বহিঃশক্তির আক্রমণ এবং সেই আক্রমণের ফলস্বরূপ নারীর উপর নির্যাতন, অপহরণের মতো ঘটনাগুলি ঘটেছে। এর ফলে নারীর স্বাধীনতায় সমাজের হস্তক্ষেপ বাড়তে থাকে। নারীর স্থান ক্রমশ হতে থাকে অন্তঃপুরে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার মতো প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় পুরুষ নারীকে অন্তঃপুরে রাখতে চেয়েছে তাকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু নারীকে শক্তিশালী করে নিজেকে রক্ষা করার শিক্ষা দেওয়া হয়নি। ভারতীয় জীবনধারায় নারী সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। নারী হবে সমাজ, পরিবার এবং চারপাশে সকলের জন্য মমতাময়ী, কল্যাণকর। নারী প্রতি যত অন্যায় অবিচারই হোক না কেন তাকে যেন সবক্ষেত্রে তা মেনে নিতে হবে। কোন নারী যদি বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমী হয় তাহলে সমাজ তাকে দেখে অন্য নজরে। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্ম লগ্নই লেখা হয়ে যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের ইতিবৃত্ত। আর নারীকে তাই পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়। এই আখ্যানগুলি আসলে আমাদের সমাজ ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। পুরুষশাসিত সমাজের কথা বললেও মনসামঙ্গল কাব্য আসলে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রতিবাদীসত্তার স্বরূপ। মঙ্গলকাব্য রচনার কারণ হিসাবে, প্রাচীন সমাজের এই অনুষঙ্গগুলি খুব সহজেই মাথায় আসে।[১] তুর্কি আক্রমণোত্তর কালে, নতুন শক্তির আগমনের কালে বাঙালির সমাজজীবন, সাংস্কৃতিক জীবনে একটা অদল-বদল এসেছিল। প্রাগার্য জাতির মানুষ দীর্ঘকাল আদিম অধিবাসী হিসেবে বসবাস করলেও বৈদিক সাংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রথম দিকে এই আদিম অধিবাসীদের তেমন স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু বিরুদ্ধ রাজশক্তির অপশাসনে এক গোষ্ঠীবদ্ধ জনজীবন গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অপৌরাণিক দেবদেবীরা দ্রুত উঠে এসে অধিকার করে নিলেন বাঙালির ধর্মবিশ্বাসের জগৎ। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক এর সূচনা থেকেই, বিভিন্ন প্রকৃতির লৌকিক শক্তি দেবাদিগের মাহাত্ম্যকীর্তন করাই এই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। মনসামঙ্গলের কাহিনি কোনও প্রাচীন পুরাণে নেই। শুধু দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ-এর মতো অর্বাচীন পুরাণগুলিতে মনসার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। বৈদিক যুগে স্ত্রীদেবতার বিশেষ কোনও স্থান ছিল না। প্রাক-বৈদিক যুগে মৃত্তিকা পূজা প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হওয়ার সময়, দেবতাদের পাশাপাশি দেবীর আধিক্য দেখা গেল। পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি স্ত্রী চরিত্ররাও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করল। মনসামঙ্গলের কবি হিসাবে হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, গঙ্গাদাস সেন, জগজ্জীবন ঘোষাল, ষষ্ঠীবর দত্ত, রামজীবন, জীবনমৈত্র, বিষ্ণুপাল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, তন্ত্রবিভূতি প্রভৃতি কবির নাম পাওয়া যায়। প্রতিটি কবির কাব্য রচনার মূল কাহিনির মধ্যে বেশ কেন্দ্রীয়ভূত মিল আছে।[২] মনসামঙ্গল কাব্যে নারীর অবস্থান বিচার করার প্রসঙ্গে আমি মূলত বিজয়গুপ্ত এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের ব্যাখ্যার উপর দিয়ে নারীর সামাজিক অবস্থান বিচার করার চেষ্টা করব। বিজয়গুপ্তের কাব্যে সমকালের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রভাব চোখে পড়ে। বিজয়গুপ্ত তাঁর কাহিনিটি রচনা করেছিলেন পাঠান রাজত্বের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে। সামন্তদের প্রতাপ, মুসলমান কাজীদের ব্যবহার, ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, ক্ষমতার লড়াই এই ধরনের সামাজিক লক্ষণগুলি বিজয়গুপ্তের কাব্যে ভিড় করে এসেছে। তাছাড়া কবি মনসা চরিত্রের গড়ে ওঠার পিছনের কারণ হিসেবে দেখেছেন দেবীর নানাবিধ অপ্রাপ্তি আর যন্ত্রণাকে। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী চরিত্র: 'আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে' প্রবন্ধে অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর লিখেছেন— "শৈশবে যিনি অমূল্য মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত যৌবনে যিনি অনতি পরিচিত পিতার কাছ থেকে কাম প্রস্তাব পান। বিমাতা চন্ডীর সন্দিগ্ধতায় যাঁকে শারীরিক নিপীড়নের সঙ্গে হারাতে হয় একটি চোখ, দেবকন্যা হয়েও যাঁর স্বর্গলোকে ঠাঁই হয় না, বিবাহ হয় ভোগসুখ বিরহিত পৌঢ় এক মুনির সঙ্গে— যিনি বিবাহের রাতেই পরিত্যাগ করে যান মনসাকে, সেই দেবী রূপী নারী পক্ষে এত যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করা সম্ভব হয় না। আত্মপ্রতিষ্ঠা লড়াই তাই মনসার কাছে এক তীব্র জীবন-সংগ্রাম।"[৩] মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাকে বাদ দিয়েও সনকা, বেহুলা,

নেতা-র মতো কিছু অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র আছে। এছাড়াও আছে চণ্ডী, পুরনরনারী, মালিনী, শঙ্কর বাউরি-র স্ত্রীর মতো কিছু চরিত্র। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলির তুলনায় মনসাকে সর্বাঙ্গভাবেই বেশি ভয়ংকর, হিংসাত্মক, দাম্ভিক করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন মনসামঙ্গল কাব্যের কথাকাররা। মনসার প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনার উপরই কোথাও না কোথাও জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখার মতো বিষয় মনসার এই তিক্ততা কি সমাজ নির্মিত নয়? নারী দেবী হলেও, শক্তিশালী হলেও আদতে সে যে, সমাজে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত; এই ভাবনায় মধ্যযুগে নারীর অবস্থানকে স্পষ্ট করেছে। মনসা দেবী হিসাবে চাঁদকে অভিশাপ দিলে চাঁদ সেই অভিশাপের প্রতুত্তর দিয়েছেন এই ভাবে। 'আমি পূজা না করলে তুমিও পূজা পাবে না।' একজন দেবীর অভিশাপের প্রত্যুত্তর করার এই দম্ভ চাঁদ চরিত্রের দৃঢ়তাকে আরও মহিমান্বিত করার চেষ্টা। পুরুষ যে মধ্যযুগের নারীর উপর কর্তৃত্ব করেছে তা সহজেই বোঝা যায়। মনসামঙ্গলের আলোচনায় চাঁদ চরিত্রটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নারীর সামাজিক অবস্থানকে বুঝতে গেলে চাঁদ চরিত্রটির উপর একটু আলোকপাত করা দরকার। চাঁদ তাঁর কার্য দ্বারা তাকে ঘিরে থাকা প্রতিটি নারী চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন। চাঁদ তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে মনসার সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত, যার ফলে তাঁর স্ত্রী সনকাকে সন্তান হারিয়ে ভোগ করতে হয়েছে। সনকাকে কেবল 'মা' হিসেবেই চিত্রিত করা হয়েছে। তাঁর নারীত্ব বা ক্রোধ সবকিছুই ঢাকা পরে গেছে চাঁদ সদাগরের ব্যক্তিত্বের কাছে। নটীরূপী মনসার ছলনায় মজে চাঁদ তাঁর মহাজ্ঞান হারিয়েছে। 'কামভাবে নটীর কাছে' নিজেকে নিবেদন করেছে চাঁদ। সাময়িক নটীর সঙ্গলাভের জন্য। বিজয় গুপ্ত তাঁর

'ছয়কুমার বধ পালা'তে বলেছেন—
"বিধাতা বিমুখ হইলে বুদ্ধিহীন হয়
নটীর কাণে চান্দ মহাজ্ঞান কয়।"[৪]

ঘরে স্ত্রী, ছয় পুত্র, পুত্রবধূ থাকা সত্ত্বেও 'মহাজ্ঞান'-এর মতো বস্তু নটীর কানে দেওয়াতে মঙ্গলকাব্যের কবি কেবলমাত্র 'বুদ্ধিহীন'-এর মতো শব্দ ব্যবহার করেছেন। চাঁদ চরিত্রের ত্রুটির কথা মনে হয়নি কবি বিজয় গুপ্তের! আসলে মনসাদেবী তাঁর বুদ্ধিবলে চাঁদের কাছ থেকে মহাজ্ঞান অর্জন করেছেন। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কবি নারীর সেই মেধা, চতুরতাকে বড় করে দেখাতে চাননি। নারী শুধুমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে থেকে গেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের আর একটি বিষয় অবশ্যই চণ্ডীর সঙ্গে মনসার সম্পর্ক। চণ্ডী নিজে একজন নারী হয়েও মনসাকে হেয় করতে চেয়েছে। স্বামী শিবকে নিয়ে এক ধরনের অধিকার হারিয়ে ফেলার ভয় চণ্ডীর মনের মধ্যে কাজ করেছে। মনসামঙ্গলের কবিরা চণ্ডীর মনসার প্রতি বিদ্বেষকে কেবলমাত্র 'সৎ মেয়ে'-এর প্রতি হিংসা, ক্রোধ হিসাবে দেখিয়েছেন। যে সমাজে স্ত্রী স্বামীর উপর নির্ভরশীল সেই সমাজে নিজের অধিকারকে ধরে রখার জন্য কবি মাতৃত্বের অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন। কারণ সমাজে নারীর অধিকার সুস্থাপিত হয় না। মনসার সঙ্গে বিবাদে চণ্ডী যখন বিষের জ্বালায় কাহিল, অবসন্ন তখন বিজয় গুপ্তের কথায়—

"চারিদিকে চাহে দেবী কাতর নয়ন
চণ্ডিকার মুখ দেখিয়া কৌতুক দেবগন।"

চণ্ডী স্বর্গের দেবতাদের বারেবারে রক্ষা করেছেন, অসুরদের হাত থেকে। যিনি 'অসুরদলনী' তাকে বিপর্যস্ত দেখে অন্য দেবতারা 'কৌতুক'বোধ করেছেন। দেবী হোক বা মানবী, নারীকে অপ্রস্তুত হতে দেখে পুরুষের এই কৌতুকসমাজে নারীর স্থানকে নির্দেশ করে। দেবী হয়ে, সর্বশক্তি হয়েও, পুরুষ দেবতাদের রক্ষক হয়েও দেবী শুধুমাত্র নারী হয়েই থেকে যান।

মনসামঙ্গলের কাহিনিতে বাঙালি ঘরের বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও দেখা যেতে পারে। মনসামঙ্গলের দেবতা ও মানুষের বৃত্তান্তের আড়ালে আছে নারী স্বাধীনতা স্বাধিকারের বিশ্লেষণ। চাঁদ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি। অন্যদিকে মনসা দেবাদিদেব মহাদেবের কন্যা হলেও সর্বহারা নারী সমাজের প্রতিনিধি। তবে নারী ও পুরুষের লিঙ্গ বৈচিত্র্যকে দূরে সরিয়ে রেখে নারীরাও পুরুষতান্ত্রিকতা স্তর ফুটিয়ে তুলেছেন নিজেদের স্বরে। মনসামঙ্গলের কাহিনির লোক প্রিয়তা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। সনকার মাতৃত্ব, বেহুলার সতীত্ব, চাঁদ সদাগরের পৌরুষ, সনকা-বেহুলা-চাঁদের সকরুণ রসের প্রস্রবণ গিরি এবং অলৌকিক কাহিনির সঙ্গে ঐশী শক্তির অন্তরালে বাঙালির চির-বেদনার মূল খুঁজে পাওয়া যায় এই কাহিনিতে। কালনাগিনী লখিন্দরকে দংশন করে। বেহুলার অকাল বৈধব্য বা চাঁদের অন্তিম পুত্র লখিন্দরের জন্য মনসা কোন সমবেদনা অনুভব করেনি। বরং প্রতিষ্ঠা লাভের পথকে প্রশস্ত হতে দেখে আত্মহারা হয়ে বলে উঠেছে—

মনসা বোলেন বাণী শুন বাছা নাগিনী
বাহির হঅ সত্বর গমনে।
সাধিলে বিষম বাদ নেই আসি পরসাদ
চল যাই আপন ভুবনে।।
ধন্য তোর জন্মদাতা সাফল তোমার মাতা
যার গর্ভে হৈল তোর জন্ম।
বানিয়ার অহঙ্কার সব হৈল ছারখার
সাধিলে দারুন মহাকর্ম্ম।।[৫]

বানিয়ার অহংকারের পতন অর্থাৎ চাঁদ সওদারের শেষ আসার প্রদীপ নিভে যাওয়াতে মনসা খুশি কিন্তু নারী হিসাবে বেহুলা বা সনকার যাতনা প্রাপ্তি নিয়ে তিনি চিন্তিত নন। এখানে মনসা বড়ই নির্মম। তাঁর নারী মননকে ঢেকে দিয়েছে পুরুষ চাঁদকে পরাজিত করবার বাসনা।

মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাকে বারে বারে নিম্নবর্গের নারীদের রূপ নিতে হয়েছে, পুরুষকে ভুলিয়ে নিজের কাজ হাসিল করার জন্য । মধ্যযুগের যে সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদের আদর্শে ঢাকা, সেই সমাজের ভণ্ডামি মঙ্গলকাব্য রচয়িতারা কাব্যে স্থান দিয়েছেন। যে নারী সামাজিক অবস্থানে নিম্নবর্গ, কামইচ্ছা জাগলে সেই নারীকেই সঙ্গী হিসাবে পেতে চেয়েছে আপাতভাবে সামাজিক অবস্থানে শক্তিশালী, উচ্চবর্গীয় পুরুষ। নারী শরীর তা সে যে-কোনও বর্ণ-কূলের হোক না কেন। পুরুষ তাকে ভোগের সামগ্রী হিসাবেই দেখেছে।

নারীর স্বাধীন ইচ্ছার মর্যাদা দেওয়ার প্রবণতা কোথাও দেখা যায় না। সনকা সর্প পূজা করলে চাইলেও চাঁদের ইচ্ছায় সনকার ইচ্ছা চাপা পড়ে যায়। চাঁদের বিক্রম এখানে মহিমান্বিত হয় কিন্তু সনকা নারী হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা থেকে যায় ঘরের অন্ধকারে আবদ্ধ।

আশুতোষ ভট্টাচার্য মনসাপূজার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বৌদ্ধ দেবী 'জাঙ্গুলী তারা'র সঙ্গে মনসার মিল খুঁজে পেয়েছেন। খ্রিস্ট্রীয় একাদশ শতকেরও আগে মনসা পূজা এই দেশের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হওয়ার পিছনে ছিল বিরূপ রাজশক্তির প্রচ্ছন্ন হুঙ্কার। এই বিরূপতা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একত্রিত হতে সাহায্য করেছিল। সেই কাহিনিকে বোঝার জন্য নানা ছাপ তৎকালীন কাব্য রচয়িতারা তাঁদের রচনায় রেখে গেছেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যটি পাঠ করে রচনার সময়পর্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার মতো বিজয়গুপ্ত তাঁর কাব্যে জানিয়েছেন পূর্বজন্মে

কীভাবে বেহুলা ঊষা নামে, লখিন্দর অনিরুদ্ধ নামে স্বর্গে অবস্থান করেছেন। চাঁদ সদাগরও স্বর্গে অবস্থান করতেন। মনসার চক্রান্তে তাঁর মর্ত্যে মানুষরূপে জন্ম গ্রহণ করেছে অব্রাহ্মণ ঘরে। শুধু মনসামঙ্গল নয় চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতুর চরিত্রের ক্ষেত্রেও আমরা পূর্বজন্মে দেবলোকে বিরাজ করার কথা জানতে পারি। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার একটা সূক্ষ্ম ছাপ এই ঘটনার মধ্যেও আছে। হিন্দু সমাজ ধর্ম, বহুজন্মবাদে বিশ্বাস মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলি অব্রাহ্মণ, নিম্নবৃত্তের মানুষের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে। এই চরিত্রগুলির পূর্বজন্মের দেবলোকের ইতিহাস জানিয়ে, সমাজের মাথা সেজে বসে থাকা ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলির সঙ্গে একটা যোগ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বিরূপ ভয়ংকর রাজশক্তির ভয় সমাজে কীভাবে কার্যকর ছিল সেই প্রসঙ্গ বোঝাতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, মনসাকে এত আত্মকেন্দ্রিক, কুটিল, হিংস্র করে গড়ে তোলার পিছনে মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের সচেতন অভিপ্রায় ছিল। মনসার সঙ্গে বিরুদ্ধ রাজশক্তির একটা যোগ ঘটানো বা বিরুদ্ধ রাজশক্তির ছায়াতে মনসাকে গড়ে তোলা। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মনসা চরিত্র বিচারের এই ব্যাখ্যা মধ্যযুগের নারীর অবস্থান বিষয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনাকে জাগ্রত করে। অন্যান্য প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির তুলনায় বেহুলা চরিত্রটি অনেকাংশেই অন্যরকম। মনসামঙ্গল কাব্য মধ্যযুগের ফসল। এই কাব্যের বেহুলা চরিত্র আধুনিক নারীর বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। বেহুলার বয়সের পরিণতি না থাকলেও তাঁর ছিল মানসিক পরিণতি। এই মানসিক পরিণতের জন্যই বেহুলার তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বুঝে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। কাহিনীর প্রথম পর্ব থেকেই বেহুলা নিজের চরিত্রের আলোকে বিকশিত। বেহুলা দৈব-বিধানের প্রতি একান্তভাবে ভক্তিমান। অন্যদিকে নিজের চরিত্রের শুচিতা সম্পর্কেও সচেতন। বেহুলার মনের গহীনে ছিল না কোন অপরাধবোধ বা হীনমন্যতা তাই পরাজয়ের কাম্যতা তাকে গ্রাস করতে পারেনি, শুধু পুরুষদের প্রভাব নয়, নারীদের কাছ থেকেও বেহুলাকে শুনতে হয়েছে পুরুষ তান্ত্রিকতার স্বর কিন্তু তারপরেও সে নিজ কর্তব্যে ও লক্ষ্যে অবিচল থেকেছে। মনসামঙ্গলের কবিগণ বেহুলার মতো আদর্শবাদী নারীকে সতীত্বের পরীক্ষায় অবতীর্ণ করিয়েছেন। কিন্তু বেহুলা নারীর এই অপমানকে শিরোধার্য না করে সামন্ততান্ত্রিক পুরুষ-সমাজকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নিজের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। চাঁদ এবং মনসা চরিত্রদুটি সমাজব্যবস্থা এবং পারস্পরিক ভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছে। এই দুটি চরিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছে বেহুলা। বেহুলার নাচে তাঁর অভীষ্ট সাধনের এক বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলকাব্যের কবিরা সচেতনভাবে মনসার মতো বেহুলা চরিত্রকেও সচেতনভাবে গড়ে তুলেছেন। আর তাই হয়তো ভীত সাধারণ প্রজার মনের দ্বিধা ভয় কাটানোর জন্য পুরুষের কর্তৃত্বে অবস্থান যে নারীর, সেই নারীর জয়জয়কার দেখানো হয়েছে বেহুলা চরিত্রের মাধ্যমে। বেহুলা একজন নারী হয়েও নিজের কলা, সাধনা, বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মনসার সমস্ত বিরূপতাকে জয় করেছে। কথাকারেরাও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এমন ভাবে নিজেদের সুপ্ত প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন। পুরুষের কর্তৃত্বে থাকা একজন নারী হয়তো সেই কারণেই হয়ে উঠেছে কাহিনির অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র। পুরুষ সামাজিক শক্তিতে নারীর চেয়ে এগিয়ে। নারী যদি পারে, তবে যে পুরুষ নারীর চেয়ে এগিয়ে সে কেন পারবে না? এই মানসিকতা কাজ করেছে বেহুলা চরিত্র সৃষ্টির পিছনে। নারীকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আসলে তাঁর অবস্থান যে পুরুষের নীচে তা বোঝানোর জন্য। মনসামঙ্গল কাব্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারে।

মধ্যযুগের সমাজে নারীর সতীত্ব, তাকে বিচার করার একটি বড় বিষয় হয়ে দেখা দেয়। যদিও নারীর সতীত্বের বিচার বর্তমান সমাজের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক তা বলার দাবি রাখে না। মনুর সময়কালের বিভিন্ন সংহিতা ও সামাজিক অনুশাসন তৈরি হওয়ার সময় থেকেই নারীর স্বাধীনতার পরিসরটি ক্রমশ হ্রাস পেতে

থাকে। 'মনুসংহিতা'য় বলা হয়েছে সুরাপান, অসৎ পুরুষ সঙ্গ, পতি বিরহ, ইতস্তত ভ্রমণ, পরগৃহে বাস এবং অকারণ নিদ্রা এই ছয়টি লক্ষণ নারীর ব্যভিচারের চিহ্ন। মধ্যযুগের সমাজেও যে মনুর এই মতবাদগুলি নারী চরিত্র বিচারের মানদণ্ড তা বোঝা যায় লখিন্দরকে সাপে কাটার বৃত্তান্তের সময়। সাপে কামড়ানোর পর যখন লখিন্দর বলে—

"জাগ জাগ বেহুলা সায় বাণ্যার ঝি।
তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি॥"[৬]

সমস্ত রাত্রি বেহুলার বুদ্ধিমত্তার কারণে লখিন্দর সাপের কামড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার পরও তাঁর অসতর্ক অবস্থায় ঘুমানোর কারণকে দায়ী করা হয়েছে লখিন্দরকে সাপে কামড়ানোর কারণ হিসাবে।

কবির সুমন তাঁর একটি বিখ্যাত গানে লিখছিলেন— "বেহুলা কখনও বিধবা হয় না এটা বাংলার রীতি"[৭], আসলে বাংলার এই রীতি পুরুষতান্ত্রিকতার রীতি, সামন্ত্রতান্ত্রিকতার রীতি। যে রীতিতে ছেলে লখিন্দর মারা যেতে পারে জেনেও পুরুষ চাঁদ সতীত্বের পরীক্ষা নিয়ে তাঁর স্ত্রী হওয়ার জন্য মেয়ে খোঁজে। সতী নারীর কাঁধে চাপিয়ে দিতে চায়, নিজের তৈরি করা অহংকারের বোঝা। লোলুপ পুরুষ পচাগন্ধে মরা কোলে বসে থাকা এক নারীর সুযোগ নিতে চায়। তাকে সাহায্য করার বদলে পুরুষ তার দিকে বাড়িয়ে দেয় কামনার থাবা। ছয় ছেলের জননী সনকাকে স্বামীর অনুপস্থিতিতে সপ্তম পুত্র জন্ম দেওয়ার সময় ভাবতে হয়, স্বামীর অনুপস্থিতিতে জন্ম নেওয়া সন্তানকে সমাজ কীভাবে মেনে নেবে।

পুরুষতন্ত্র আসলে একটা চিন্তা ধারা। যার বীজ নারী-পুরুষ ভেদে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে থাকতে পারে। নারীর পুরুষ মন অনেক সময় অন্য নারীর অস্তিত্বের উপর প্রশ্ন তোলে এই পুরুষ মনের তাড়নায়। সনকা জানতেন লখিন্দর মারা যেতে পারে। এই সম্পর্কে সনকার ধারণা থাকা সত্ত্বেও সদ্য স্বামীহারা বেহুলাকে বলেছে—

সোনা বলে বধূ তুমি পরম রূপসী।
আমার বাছা খাইতে আইলা কপট রাক্ষসী।।
স্বরূপে জানিলাম তুমি নিশাচর জাতি।
বিয়ার রাত্রে খাইলা স্বামী নহিল বাসি রাতি।।[৮]

বিধবা হওয়ার অভিশাপ সম্পর্কে নারী হিসাবে সনকা অবগত। বেহুলাকে দোষারোপ করার পিছনে সনকার পুরুষ মনের তাড়না কাজ করেছে। এমনকী নারীকে সতীত্বের ফানুসে উড়িয়ে পুরুষ সমাজ তার পায়ে বেড়ি পড়িয়ে রেখেছে। লখিন্দর মারা যাবার পর বেহুলার একটি উক্তিতে তাঁর প্রমাণ মেলে—

"খাইনু আপন পতি
কে মোরে বলিবে সতী॥"

পুরুষ সমাজ যখন নারীর সমান অধিকারের দাবিকে কেবলমাত্র ঠুনকো সতীত্বের আবরণে ঢেকে রাখতে চায় তখন বেহুলাদের মতো মেয়েদের কাছে সতী হওয়াটাই সম্মান পাওয়ার একমাত্র মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়।

পুরো মনসামঙ্গল কাব্য জুড়েই মনসার নারীত্বের রূপ এর অজস্র মণিমুক্ত ছড়িয়ে আছে। চাঁদকে বিপদে ফেলেও মনসা তাকে রক্ষা করেছেন আবার 'বস্ত্র বিবর্জিত' চাঁদকে দেখে লজ্জাশীল নারীর মতো তাকে কাপড় জুগিয়েছেন। চাঁদের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজের নারীত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে লড়াই করেছেন। শিব কন্যা হওয়ার পরও দেবীত্ব অর্জন করেছেন, বংশ পরম্পরায় পাননি। কিন্তু তবুও বেহুলাকে তাঁর হারানো ঐশ্বর্য ফিরিয়ে দেবার পর বেহুলা মনসাকে বলেছে—

"তুমি গো পুরুষ নারী"

মনসামঙ্গল কাব্যে নারীর সামাজিক অবস্থানের সত্যতা আসলে এখানেই, যেখানে একজন নারীর নারীত্ব সম্মান পায় না। তাকে সমস্ত লড়াইয়ের শেষে শুনতে হয় সে 'পুরুষ নারী'। অর্থাৎ পুরুষ বা পুরুষত্ব তাঁর নারীত্বকে হরণ করে নেয়। পুরুষ নারীর অধিকারকে খর্ব করে দেয়। পুরুষতান্ত্রিকতার আবরণে আবদ্ধ থাকতে থাকতে নারী কখনও পুরুষের মনকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠার চেষ্টা করেছে। মনসা, সনকা, বেহুলা সকলেই হয়ে উঠেছে সামাজিক পরিকাঠামোর শিকার। কিন্তু সবশেষে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই, মনসা, সনকা, বেহুলা প্রমূখ নারী চরিত্র তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, বুদ্ধিমত্তা, আত্মসচেতনতাই পাঠকের মনে জায়গা করে নিয়েছে। সমাজ-সংস্কার, কঠোর অনুশাসনের বিরুদ্ধে তাদের এই স্বীকারবোধ পাঠককে বারে বারে বিস্মিত করে ভাবতে বাধ্য করেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের নারীর অবস্থানকে বোঝার পর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, একবিংশ শতব্দীতে দাঁড়িয়েও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য কেন পড়ব? বর্তমানকে বোঝার জন্য, বর্তমানে নারীর অবস্থানকে বোঝা জরুরি হয়ে পড়েছে। মধ্যযুগের পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শে কীভাবে নারীত্বের ধারণা গড়ে উঠেছে, সেটা জানা প্রয়োজন। আলথুসারের মতাদর্শ ও ক্ষমতা-কাঠামো বিষয়টি এখানে বলা দরকার। তাঁর মতে মতাদর্শ শ্রেণি-বর্ণ-লিঙ্গ বিভক্ত সামাজিক ক্ষমতার অসম বিন্যাসকে 'স্বাভাবিক ও প্রকৃতিদত্ত' হিসাবে উপস্থাপিত করে আর সে কারণেই এই সব বিভাজনকে প্রশ্নহীন মেনে নিতে বলে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি হল 'মতাদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রীয় যন্ত্রগুলোর' অন্যতম একটি অংশ। আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে জানতে হবে মধ্যযুগের এই পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের স্বরূপকে বোঝার জন্য।[৯] বাংলাদেশের বিখ্যাত সংগীত শিল্পী সায়ন একটি গানে লিখেছিলেন—

"রেখো মাটির পরে দুটি পা রেখো মাটির সাথে দস্তি।"[১০]

মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীর অবস্থানকে জানা আদতে মাটিতে পা রাখা। বন্ধুত্ব রাখা মাটির সঙ্গে, যার উপর ভর করে আজকের মেয়েরা পুরুষতান্ত্রিকতা, ব্রাহ্মণ্যবাদের তৈরি করা ঝুট মোহ জাল ভেঙে নতুন আলোর পথের সন্ধান দেবে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পাদিত)। প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা। কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, ২০০৮ পৃ.৩৫-৪৯।

২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ (সম্পাদিত)। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। কলকাতা, কলিকাতা বুক হাউস, ১৩৪৬, পৃ.১৫-৪২।

৩. গিরি, সত্যবতী ও মজুমদার, সমরেশ (সম্পাদিত)। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন। নস্কর সনৎকুমার। মঙ্গলকাব্যে দেব-দেবী চরিত্র: আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত রত্নাবলী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ— পৌষ ১৪১৮, পৃ- ১৫৭।

৪. https://www.milansagar.com/kobi/bijoy_gupta/kobi-bijoygupta_kobita10.html, সময় 10:41 A.M, তারিখ: 10/03/2026

৫. ভট্টাচার্য, শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র ও দাস, আশুতোষ (সম্পাদিত)। কবি জগজ্জীবন বিরচিত ও মনসামঙ্গল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪, পৃ- ২২৭।

৬. ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস। ভট্টাচার্য, আশুতোষ (সম্পাদিত)। মনসামঙ্গল। কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, পৃ.২০২।

৭. কবির সুমনের গানের লিঙ্ক: https://www.youtube.com/watch?v=L4by83FqkRQ সময় 01:41 A.M, তারিখ: 01/03/2026।

৮. গুপ্ত, বিজয়, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, শ্রীবসন্ত কুমার ভট্টাচার্য (সংকলক), শুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৪২, পৃ:২০৭।

৯. দাস, অপু (সম্পাদিত)। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ: নারীবাদী পাঠ। কলকাতা, বাণীশিল্প, ২০১৬, পৃ.২১-২৩

১০. সায়নের গানের লিঙ্ক: https://www.youtube.com/watch?v=vDhJTrVO38U সময় 12:41 P.M, তারিখ: 22/02/2026।